কোয়ান্টাম বুলেটিন

বিশেষ সংখ্যা

ভার্চুয়াল ভাইরাস ॥ নীরব ঘাতক
নিজে বাঁচুন, পরিবারকে বাঁচান

ফেসবুক
টুইটার
স্ন্যাপচ্যাট
ইনস্টাগ্রাম
সেলফি
ইউটিউব
ভার্চুয়াল গেম
স্মার্ট টিভি
স্মার্টফোন
ইন্টারনেট
আসক্তি

সচেতন হোন এখনই, আজ থেকেই। ভার্চুয়াল ভাইরাসের ব্ল্যাক হোল থেকে বেরিয়ে আসতে যত দ্রুত উদ্যোগী হবেন তত ভালো থাকবেন আপনি। ভালো থাকবে আপনার পরিবার। এ মহামারী থেকে তাই নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার সন্তানকে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে আজ যেখানে যত অস্থিরতা হিংস্রতা নেতিবাচকতা, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিদদের গবেষণা-অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এসবের একটি বড় কারণ এই ভার্চুয়াল ভাইরাস। যে মড়কে আজ পৃথিবীব্যাপী একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন ও বিশ্বস্ততা, সামাজিক সম্প্রীতি ও সমমর্মিতার মতো মানবিক উৎকর্ষের চিহ্নগুলো।

বিশ্বজুড়ে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রতিবেদনগুলো বলছে, স্মার্টফোন-ইন্টারনেটের লাগামহীন ব্যবহার আর গেম-ইউটিউব-সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি জীবনঘাতী মাদকে আসক্তির মতোই ভয়াবহ। যাকে গবেষকরা অভিহিত করেছেন 'ডিজিটাল কোকেন' হিসেবে! তাদের মতে, মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট মাদকের চাহিদা সৃষ্টি হলে যে রাসায়নিক নিঃসরিত হয়, ঠিক একই ঘটনা ঘটে এসব প্রযুক্তিপণ্যে আসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও। আর এ আসক্তির শিকার আজ ধনী-গরিব নির্বিশেষে লক্ষ কোটি শিশু-কিশোর-তরুণসহ প্রায় সব বয়সী মানুষ।

শুধু তা-ই নয়, দেশে দেশে এখন জটিল মনোদৈহিক রোগ-ব্যাধির প্রধানতম কারণ হিসেবেও এই ভার্চুয়াল ভাইরাসকেই দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যা শুধু ব্যক্তির জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বিষহ করে তুলছে না, হুমকির মুখে ফেলেছে মানব সভ্যতার চিরায়ত মূল্যবোধগুলো। সামাজিক যোগাযোগ নামধারী অবক্ষয়ের নিঃশব্দ ঘুণপোকা আজ ক্রমাগত ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষে মানুষে সম্পর্কের শাশ্বত ভিত্তি।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন ভার্চুয়াল গেম ও সাইটে আসক্তি আর সেলফি হুজুগ আজকের তরুণদের করে তুলছে আত্মকেন্দ্রিক, বিষণ্ন, পরিবার-বিচ্ছিন্ন ও হতাশাক্রান্ত। এদের সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন রীতিমতো চালু করতে হচ্ছে স্মার্টফোন রিহ্যাব সেন্টার!

তাই আসুন, নিজে সচেতন হই। সচেতন করে তুলি আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী-সহকর্মীদের। ভার্চুয়াল ভাইরাসের মরণ-আগ্রাসন থেকে বাঁচাই সন্তান ও পরিবারকে। বাঁচাই প্রিয় দেশবাসীকে। আর এ সচেতনতার পথ ধরেই সূচিত হোক আমাদের নৈতিক পুনর্জাগরণ। মানবিকতার অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিক প্রিয় বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞদের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করুন

- পরিবারকে সময় দিন। পরিবারের জন্যে বরাদ্দ সময়ে টিভি-কম্পিউটার-স্মার্টফোনসহ সব ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকুন। সন্তান, মা-বাবা, ভাইবোন, ও আত্মীয়দের সাথে বাস্তব যোগাযোগ ও একাত্মতা বাড়ান।
- আপনার স্মার্টফোন থেকে ফেসবুক-টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যাবতীয় অ্যাপস আজই ডিলিট করে দিন। পেশাগত/ শিক্ষাগত প্রয়োজনে এসব ব্যবহার করতে হলেও তা করুন শুধু কম্পিউটার/ ল্যাপটপে, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে।
- শিক্ষার্থীদের ওপর মোবাইল ফোনের বিরূপ প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে ফ্রান্স সরকার স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করেছে। যথাযথ উদ্যোগ নিন আপনিও।
- নিজের ও সমাজের কল্যাণে সৎসঙ্ঘে সক্রিয় থাকুন। সমমনা মানুষদের সাথে গড়ে তুলুন প্রত্যক্ষ সামাজিক যোগাযোগ।
- দৈনন্দিন জীবনে মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চার পাশাপাশি সুস্থ জীবন-অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে ঘটবে আপনার আত্মশক্তির জাগরণ– ফলে সব ধরনের আসক্তিকে 'না' বলতে পারবেন আপনি।

সাবধান!

ভার্চুয়াল ভাইরাস!!

ফেসবুক টুইটার স্ন্যাপচ্যাট ইনস্টাগ্রাম সেলফি ইউটিউব ভার্চুয়াল গেম, স্মার্ট টিভি, স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট আসক্তি

নিজে বাঁচুন
সন্তানকে বাঁচান

পিলে চমকানো সব বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে গবেষকরা বলছেন, এসব ভার্চুয়াল ভাইরাস মাদকাসক্তির চেয়েও মারাত্মক—যার মর্মান্তিক পরিণতি শুধু ব্যক্তিকে নয়, ধ্বংস করে দিতে পারে পরিবার, সমাজ এমনকি একটি জাতিকেও।
তাই আসুন, সময় থাকতে সচেতন হই। ভার্চুয়াল ভাইরাসের মরণ-আগ্রাসন থেকে নিজে বাঁচি। বাঁচাই সন্তানদের। সচেষ্ট হই আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীদেরও বাঁচাতে। বাঁচাই প্রিয় দেশবাসীকে।

quantummethod.org.bd

ভার্চুয়াল ভাইরাসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে কোয়ান্টাম প্রকাশিত বিশেষ ফোল্ডার

কোয়ান্টাম প্রকাশিত সচেতনতামূলক স্টিকার, দেশজুড়ে সংগ্রহ করছেন সর্বস্তরের মানুষ

শিক্ষাবিদ, লেখক এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন তরুণ প্রজন্ম ও অভিভাবকদের। এ বিষয়ে তার একটি আলোচিত কলামের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

ফেসবুক-ইন্টারনেট আসক্তি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

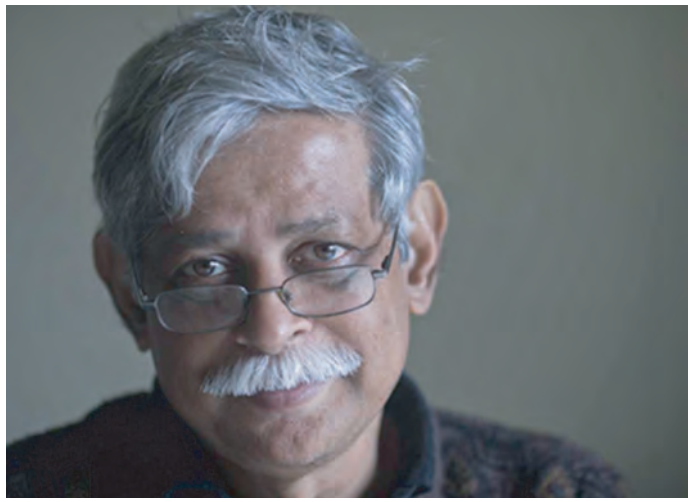

একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক।

আপনি একজন বাবা কিংবা মা, আপনার ছেলেমেয়েরা বড় হয় নি, তারা স্কুল-কলেজে পড়ে। একদিন আপনি বাসায় এসেছেন, এসে দেখলেন আপনার ছেলে বা মেয়েটি টেবিলে পা তুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা সিগারেট টানছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছিস বাবা (কিংবা মা)?'

আপনার ছেলে কিংবা মেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'সিগারেট খাচ্ছি আম্মু (কিংবা আব্বু)।'

তারপর টেবিল থেকে পা নামিয়ে বলল, 'খাওয়ার পর একটা সিগারেটে টান না দিলে ভালোই লাগে না।'

কথা শেষ করে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করল।

আপনি বললেন, 'ঠিক আছে বাবা (কিংবা মা) সিগারেটটা শেষ করে হোমওয়ার্কগুলো করে ফেল।'

কথা শেষ করে আপনি ভেতরে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন : 'আমার ছেলেটি (বা মেয়েটি) কত লক্ষী। বাইরে কোনো ঝুট-ঝামেলার মাঝে যায় না। ঘরের মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে সিগারেট খায়!'

আমি জানি, আপনারা যারা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ের বাবা তারা আমার এই কাল্পনিক দৃশ্যটির বর্ণনা শুনে যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, একজন বাবা কিংবা মা তার ছেলে বা মেয়ের এরকম একটা আচরণকে কখনো এত সহজভাবে নিতে পারে না।

অবশ্যই নিতে পারে না এবং কখনো নেয় না।

সিগারেট হচ্ছে নেশা। এরকম আরো অনেক নেশা আছে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো দেখে অভ্যস্ত নই। তাই কাল্পনিক দৃশ্যটিতে অন্য নেশাগুলোর কথা না বলে সিগারেটের উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সন্তান কোনো একটা নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা সেটা মেনে নিতে পারব না। আমরা দুশ্চিন্তিত হবো, বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। যদি এই বিষয়টা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

যে বিষয়টি এতদিন একটা সন্দেহ বা আশঙ্কা ছিল, এখন সেই বিষয়টি গবেষণা জার্নালে বের হতে শুরু করেছে। কোকেন-আসক্ত একজন মাদকাসক্ত মানুষকে যদি মাদক খেতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে যে কেমিক্যালগুলো বের হয়ে তাকে অস্থির করে তোলে, ফেসবুকে আসক্ত একজন মানুষকে যদি ফেসবুক করতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে সেই একই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ছেলেমানুষী বিনোদন নয়, বিষয়টি মাদকে আসক্তির মতো গুরুতর একটি ঘটনা।

কারো কারো কাছে নিশ্চয়ই মনে হতে পারে, আমার পুরো বক্তব্যটা বুঝি একধরনের বাড়াবাড়ি। বিষয়টি মোটেও এমন কিছু গুরুতর নয়। কিন্তু আমি মোটামুটি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি–বিষয়টা যথেষ্ট গুরুতর।

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সেটা যথেষ্ট রহস্যময়। একজন ছেলে বা মেয়ে যখন বড় হচ্ছে সেই সময়টাতে সে কীভাবে তার মস্তিষ্ক ব্যবহার করেছে, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার মস্তিষ্কের গঠনটি কেমন হবে। তাই একজন বড় মানুষের ফেসবুক আসক্তি দেখে আমি যতটুকু বিচলত হই তার থেকে অনেক বেশি বিচলিত হই, যদি সেটি হয় কমবয়সী একটি ছেলে বা মেয়ের আসক্তি।

আজ থেকে ১০ বছর পরে হয়তো আমরা জানতে পারব শৈশব-কৈশোরে মাঠে-ঘাটে ছোটাছুটি করে খেলাধুলা না করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ছোট একটা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার কারণে আমাদের কী ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমাদের কিছু করার থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে একটুখানি কমনসেন্স হয়তো আমাদের অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

যারা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করছেন আমি তাদের এতটুকু খাটো করে দেখছি না। কিন্তু এই প্রযুক্তি যাদের ব্যবহার করছে, আমার দুশ্চিন্তা তাদের নিয়ে!

সবাই হয়তো জানে না, যারা এই প্রযুক্তি গড়ে তুলছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছলে-বলে-কৌশলে কোনো একজনকে তাদের ওয়েবসাইটে কিংবা পোর্টালে নিয়ে আসা এবং যত বেশি সম্ভব তাদের সেখানে আটকে রাখা। যারা আমার কথা বিশ্বাস করেন না তাদের বলব–'বিবিসি'র মতো কোনো সম্ভ্রান্ত একটা নিউজ মিডিয়ার সাইটে যেতে। আশেপাশে তাকান, আপনি কী দেখবেন?

সারা পৃথিবীতে কত গুরুতর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে ওসবের চিহ্ন নেই। একেবারে না দিলেই নয় সে-রকম একটি-দুটি ঘটনার পাশাপাশি শুধু রগরগে চটুল খবর। তার যে-কোনো একটাতে ক্লিক করে দেখেন আপনাকে নিজে থেকে তারা একটার পর একটা ভিডিও দেখাতে শুরু করবে, আপনার মনের জোর যদি যথেষ্ট বেশি না থাকে কিছু বোঝার আগেই আপনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভিডিও দেখে দেখে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করে ফেলবেন।

আপনি কোন ধরনের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন সেটি বিশ্লেষণ করে আপনাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা সেই ধরনের জায়গায় ঠেলে দেবে! শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করেছেন বলে এই সাইবার জগৎ কিন্তু আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানে।

'লাইক' দেওয়া নিয়ে কিছুদিন আগে আমি একটা সত্যি ঘটনা শুনেছি। একটি বাচ্চা মেয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলে কিছু একটা পোস্ট করে দিয়ে অপেক্ষা করে আছে সেখানে কেউ 'লাইক' দেবে। যখন দেখতে পেল কেউ তাকে খেয়াল করে 'লাইক' দিচ্ছে না, তখন সে নিজেই আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেকে 'লাইক' দিতে থাকল!

বিষয়টা একটা কৌতুকের বিষয় কিন্তু তারপরও এটা শুনে আমি কেন জানি একটু আহত অনুভব করেছি। আমার মনে হয়েছে কেন আমার দেশের একটি ছোট মেয়ে জীবনের প্রতি এরকম একটা দীনহীন মনোভাব নিয়ে কাঙালের মতো বড় হবে? কে ঠিক করে দিয়েছে জীবনকে অর্থপূর্ণ হতে হলে ফেসবুকে 'লাইক' পেতে হবে?

কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক ইন্টারনেট আসক্তি কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয়, ফেসবুক আসক্তি একটি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়। আমি তাই সবাইকে মনে করিয়ে দেই, অনলাইন জীবনের পাশাপাশি যে রক্তমাংসের বাস্তব জীবনটি আছে সেটি যেন আমরা ভুলে না যাই।

তথ্যসূত্র : বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম
২৪ মার্চ ২০১৭

আমাদের সন্তান কোনো একটা নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা দুশ্চিন্তিত হবো, বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

ভার্চুয়াল বিপদ ॥ সত্য জানুন

ক্লাসের স্মার্ট ছেলেটি, অফিসের করিৎকর্মা সহকর্মী, প্রতিবেশী ভাবি–কার নেই ফেসবুক আইডি! সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন! অতএব আমারও চাই। ব্যস, এভাবেই শুরু হয়ে গেল একঝাঁক ফেসবুক বন্ধু নিয়ে ভার্চুয়াল জীবন।

কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত তথ্য-উপাত্তগুলো বলছে, ফেসবুক চালাতে চালাতে কখন যে আপনি আসক্ত হয়ে যাবেন, টেরই পাবেন না। হুঁশ ফিরবে যখন, ততক্ষণে শরীর-মন আর পরিবারে অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। ফিরে পাবেন না আপনার ক্ষয়ে যাওয়া সময়-মেধা-অর্থ।

তথাকথিত সামাজিক যোগাযোগের বিধ্বংসী মাধ্যমগুলো তৈরির উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনি যেন এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন দিবারাত্র। আর এদিকে ভারী হতে থাকবে তাদের পকেট। আসুন, জেনে নিই বিশ্বব্যাপী নানা গবেষণায় উঠে আসা তথ্যগুলো :

বায়বীয় জগতে নিঃসঙ্গ প্রজন্ম

ফেসবুক ও ইউটিউবসহ ১১টি ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানীরা। এতে অংশ নেন ১৯ থেকে ৩২ বছর বয়সী ১,৭৮৭ জন, যারা দিনে দুই ঘণ্টার বেশি সময় এসব বায়বীয় মাধ্যমে ব্যয় করে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল একাকিত্ব। গবেষণায় আরো উঠে এসেছে, ভার্চুয়াল জগতে যারা যত বেশি সময় কাটায়, তাদের নিঃসঙ্গতা তত বেশি। তারা তত বেশি সমাজ-বিচ্ছিন্ন।
(দ্য টেলিগ্রাফ, ৬ মার্চ ২০১৭)

ফেসবুক আসক্তি = মাদকাসক্তি

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই ক্ষতিকর। *জার্নাল সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট: ডিজঅ্যাবিলিটি এন্ড ট্রমা*-তে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে এমন মানুষদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের সাথে মিলে গেছে মাদকদ্রব্য ও জুয়ায় আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন।

ছবিতে লাইক পাওয়ার আগ্রহ মস্তিষ্কে নিঃসরণ করে ডোপামিন নামক হরমোন। ড্রাগ গ্রহণের সময় বা জুয়ায় জিতলে মস্তিষ্কে এই একই হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। *(দ্য সান, ৬ জুলাই ২০১৬)*

স্মার্টফোন ও ভিডিও গেম ॥ মেধাশূন্য ও আগ্রাসী হয়ে উঠছে তরুণেরা

ভিডিও গেম খেলার সময় ব্যক্তির মনে হয়, গেমের জগতটাই বাস্তব, এখানকার সবকিছু সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে। গেমে আসক্ত ব্যক্তি বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ বোঝে না–সে সাজানো নাটকের অংশমাত্র। এ কথাগুলো বলেছেন, আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট ডগলাস জেনটাইল।

আঁতকে ওঠার মতো একটি ঘটনা ঘটে ২০১০ সালে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক দম্পতি অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে সারাদিন সাইবার ক্যাফেতে পড়ে থাকত। একপর্যায়ে গেমের মধ্যে কাল্পনিক একটি শিশুকে নিয়ে তারা এতই মনোযোগী ছিল যে, বাস্তবে নিজেদের তিন মাস বয়সী সন্তানকে দিনে খাবার দিত মাত্র একবার। অনাহারে-অযত্নে শেষপর্যন্ত মারা যায় ছোট্ট শিশুটি। *(সিএনএন, ৫ মার্চ ২০১০)*

জার্মানির মিউনিখে ১৮ বছরের এক তরুণ অতর্কিত হামলা চালিয়ে নয় জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় সে ছিল সহিংস গেমে আসক্ত। দীর্ঘ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, সহিংস গেমগুলো কিশোরদের প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হিংস্র করে তুলছে।
(টাইম ম্যাগাজিন, ১৭ আগস্ট ২০১৫)

শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে

শিশু-কিশোর সন্তানদের সামলাতে এখন ঘরে ঘরে মা-বাবার নাজেহাল অবস্থা। সন্তান আর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। থাকবে কীভাবে? সন্তানকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে মা-বাবারই কিনে দেয়া স্মার্টফোন আর ভিডিও গেম!

২০১৬ সালের ইউনিসেফ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু।

এ-ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমেরিকায় স্কুল থেকে ঝরে যাওয়া, পরিবার-বিচ্ছিন্ন হওয়া, সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারা তরুণদের এ সমস্যাগুলোর নেপথ্যে আছে ইন্টারনেট আসক্তি।
(ওয়াশিংটন পোস্ট, ২০ মে ২০১৬)

বিষণ্নতায় আক্রান্ত কৈশোর ॥ পরিণতি হতে পারে আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের তথ্য হলো, ২০১০ থেকেই ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের বিষণ্নতায় ভোগা ও আত্মহত্যা-প্রবণতা বেড়ে গেছে। কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই হার তুলনামূলক বেশি। পরবর্তী পাঁচ বছরে যা আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগে। আর বিষণ্নতায় ভোগার হার বেড়েছে ৩৩ ভাগ। গবেষকদের মতে, এজন্যে দায়ী স্মার্টফোন ও প্রযুক্তিপণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার।

যেসব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে দিনে পাঁচ ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করছে, তাদের ৪৮ ভাগ অন্তত একবার হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। *(হিন্দুস্তান টাইমস, ১৫ নভেম্বর ২০১৭)*

সাইবার বুলিং ॥ নৃশংসতার নতুন ফাঁদ

অনলাইনে অশালীন কথা ও ছবি, অকথ্য গালিগালাজ, এমনকি হত্যার হুমকির নামই সাইবার বুলিং। আমাদের দেশেও ঘটছে এ ধরনের ঘটনা।

ঢাকার উত্তরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরি হওয়া পাঁচটি গ্রুপের খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। পারস্পরিক বিবাদ প্রথমে ফেসবুকে অশোভন ভাষায় হুমকি দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা রূপ নেয় বাস্তব নৃশংসতায়। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি একটি গ্যাং-এর কিশোররা খুন করে তাদেরই সহপাঠীকে।

গুরুতর মানসিক রোগ 'সেলফিটিস'

ঘন ঘন সেলফি তোলা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্যে ব্যাকুল হওয়ার নামই সেলফিটিস। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণত যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং অনুকরণপ্রিয় (ট্রেন্ডি), তারাই মূলত সেলফি রোগে আক্রান্ত।
(দ্য টেলিগ্রাফ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে মনোদৈহিক স্বাস্থ্য-সমস্যা

দ্য স্পাইনাল জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘক্ষণ ঝুঁকে ফেসবুক ব্যবহারে ঘাড়ে ক্রমাগত চাপ পড়ে। এ চাপের পরিমাণ একজন ব্যক্তির মাথার ওজনের প্রায় ছয়গুণ। ফলে ফেসবুক আসক্তরা আক্রান্ত হচ্ছে 'টেক্সট নেক' নামক ঘাড়ব্যথায়।

আবার আমেরিকার ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়া, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারণও হচ্ছে দীর্ঘসময় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিনের দিকে এভাবে ঝুঁকে থাকা।
(নিউইয়র্ক টাইমস, ২৫ জানুয়ারি ২০১৮)

আসক্ত হয়ে পড়ছেন না তো!

একজন গড়পড়তা ব্যবহারকারীও দিনে অন্তত দেড়শ বার স্মার্টফোনের মেসেজ বা নোটিফিকেশন চেক করেন। শুধু তা-ই নয়, প্রয়োজন ছাড়াই স্মার্টফোনের স্ক্রিন অন-অফ করেন বা ওয়ালপেপার দেখেন দিনে অন্তত দু-হাজার বার।
(দ্য গার্ডিয়ান, ১১ নভেম্বর ২০১৭)

গবেষকদের ভাষ্য হলো, যারা অ্যালকোহলিক তারাও যুক্তি দেন–'আমার তো কোনো সমস্যা হয় না, বরং কিছুটা পান করলেই আমি বেশ চনমনে থাকি আর আমি মাতালও হই না।' কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার ঠিকই হয়, যা-ই বলুক তারা।

সচেতন হওয়ার দায়িত্ব আপনার

প্রিয় পাঠক, ভার্চুয়াল জগতের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সত্যটা তো জানলেন। এবার সচেতন হওয়ার পালা। এ দায়িত্ব একান্তই আপনার।

শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যা বলছেন

ফেসবুক নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশেষত আমাদের তরুণরা এখন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। এটি একটি রোগ। আজ আমাদের পরিবারগুলো হয়ে পড়েছে এই বিচ্ছিন্নতাবোধের সবচেয়ে নির্মম শিকার।

ফলে সমাজের সর্বত্রই কারো সাথে কারো সত্যিকার যোগাযোগটা আর হচ্ছে না। একটা সময় ছিল, যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো ছিল মানুষে মানুষে মিলনের কার্যকর ক্ষেত্র। যেমন : গ্রন্থাগারে যাওয়া, গান-আবৃত্তি-নাটকে সবাই মিলে অংশ নেয়া, একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের প্রায় কিছুই এখন নেই। সিনেমাও এখন লোকে আর হলে গিয়ে দেখে না, যার যার ঘরে বসে দেখে।

এর প্রতিকারের জন্যে চাই সামাজিক যোগাযোগ। ফেসবুকের যোগাযোগ নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ। আমি একা ঘরে বসে লিখছি, গাইছি, সিনেমা দেখছি–এ ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, মহল্লায় সবখানেই সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আর এভাবেই পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আমরা একটি চাঙ্গা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব বলে আমি মনে করি। কারণ বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাঁচতে পারব না। শেষপর্যন্ত এ ব্যবস্থার বদল আমাদের করতেই হবে।

[শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত

আবুল মোমেন

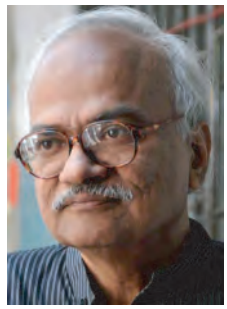

শিশুদের নিয়ে ৪১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি–সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, সে চায় দৃষ্টান্ত। সে সবকিছু দেখে দেখে শেখে। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকেই আয়ত্ত করে।

মা-বাবা ঝগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা গ্রহণযোগ্য। আর দেখতে হবে, বয়স-উপযোগী শিক্ষাটা ওর হচ্ছে কিনা। তাকে লার্নিং অব লাইফ দিতে হবে। এ শিক্ষা আমাদের দেশে স্কুল দেয় না, তাই এ কাজ করতে হবে বাবা-মা-পরিবারকে।

সবাই জিপিএ ফাইভের ফাঁদে পড়ে গেলে শিশুরা সামগ্রিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হবে। তখন অঙ্কে ইংরেজিতে সে দুর্দান্ত রেজাল্ট করবে কিন্তু তার মানবিক বোধগুলো বিকশিত হবে না। দেখা যাবে, সে নানারকম ভুলভ্রান্তি করছে। কারণ তার মূল্যবোধের জায়গাটা ফাঁকা।

ইদানীং একটা প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে যাদের অধিকাংশই সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারে না। তারা মনে করে মিথ্যা দিয়েও সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। এ বিষয়টাই সবচেয়ে ভয়ংকর। এভাবে সমাজ বেশি দূর যেতে পারে না।

[কবি, লেখক ও কলামিস্ট। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামে শিশু সাদাকায়নে প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি

অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক

আগে জীবনে ফেসবুক ছিল না, তবে শান্তি ছিল। এখন ফেসবুক না দেখে আমরা দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারি না–কে কী লিখল, কে কার বদনাম করল, তার উত্তর না দিলে রাতে আমাদের ঘুম পর্যন্ত আসতে চায় না!

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন কী হচ্ছে? যেই কারো সাথে কিছু হলো–কাছের কিংবা দূরের, পরিচিত বা সামাজিকভাবে চেনা–অমনি সে তার নামে একটা নেতিমন্তব্য করে দিল ফেসবুকে। মুহূর্তেই সেটি জেনে গেল আরো অনেক মানুষ। বহুদিনের সম্পর্ক, এক মন্তব্যেই শেষ!

এভাবে নিজেদের শান্তি নষ্ট করছি আমরা। সমাজে বৈরিতা বাড়ছে, প্রতারণা বাড়ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে। আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি। ফলে এক ধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবিক গুণগুলো।

[মনোচিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম

আমি তখন বিলেতে পড়াশোনা করি। একদিন শুনলাম, সেই দেশের পারমাণবিক কেন্দ্রে যারা কাজ করে প্রতিদিন কর্মস্থলে ঢোকার সময় মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তাদের। কারণ কোনো কারণে হঠাৎ যদি সে ভুল করে একটা টিপ দিয়ে বসে, সারা পৃথিবী মুহূর্তেই শেষ! কিন্তু এভাবে পরীক্ষা করে কয়দিন? সারাদিন যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে যে মানুষ একেবারে যন্ত্রের বশীভূত হয়ে গেছে, তাকে তো যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান যুগে মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, তার জীবনযাত্রার মান ও শক্তি-সম্পদ অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে। কিন্তু ধন-জ্ঞান-জন, এ-ই কি সব? পাল্লা দিয়ে যে বাড়ছে নৃশংসতা লোভ ঘৃণা যুদ্ধ ও গণহত্যা! কমছে মমত্ববোধ ও সম্প্রীতি। তাই এ কালে আমাদের অর্জন অনেক–এটা সত্যি, কিন্তু বিসর্জনও কম নয়।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনতত্ত্বের অধ্যাপক ও লেখক। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যে আসক্তির কারণে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা কমে যাচ্ছে

অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা

ইদানীং শিশুদের অনেকেই বয়স হওয়ার পরও কথা বলছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মা-বাবা অফিসে চলে যান আর কাজের লোকের সাথে বাচ্চাটা সারাদিন টিভি দেখে। কিছু কিছু মা-বাবা মোবাইলে কম্পিউটারে কার্টুন দেখিয়ে, ভিডিও দেখিয়ে বাচ্চাকে খাবার খাওয়ান। এভাবে তারা নিজের অজান্তেই সন্তানকে আসক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

এখনকার বাচ্চারা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায়, অনেক বেলা করে ওঠে। রাত জেগে টিভি দেখাটা সে শিখছে বাবা-মার কাছ থেকে। কম ঘুমের ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা কমে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বসে শিশুরা সবসময় শুধু স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকছে। এতে বাড়ছে মেদস্থূলতা, চোখেরও ক্ষতি হচ্ছে। বছর দেড়েক আগে একটি জাতীয় দৈনিকে লিড নিউজ ছিল–ঢাকা শহরে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি শিশুর চোখে এখন চশমা লাগে। এ-ছাড়া রেডিয়েশনের প্রভাব তো আছেই। অনেকে ঠিকমতো কানেও শোনে না। লেখাপড়াতেও তাদের মনোযোগ কমে যাচ্ছে দিন দিন।

বাচ্চাদের ধ্যানজ্ঞান এখন স্মার্টফোন। এতে করে সামাজিক আদব-কায়দা, অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান, কিছুই সে শিখছে না। প্রযুক্তিপণ্য-আসক্ত এ শিশুরা যেন জড় পদার্থ হয়ে যাচ্ছে। এই যে স্বাস্থ্যগত এবং সামাজিক সমস্যা–এর পেছনে এই ভার্চুয়াল ভাইরাসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আমি মনে করি, অভিভাবকদের এখনই সচেতন হতে হবে। নিজেকে ও পরিবারকে শৃঙ্খলার ভেতরে আনতে হবে। স্মার্টফোন-সহ এ ধরনের জিনিসগুলোর ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো

আসাদুজ্জামান নূর

আমার বাড়ির কাছেই একটা স্কুল আছে। রোজ সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, অনিচ্ছুক বাচ্চাগুলোকে মায়েরা টানতে টানতে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। অত সকালে তো কারো স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না, আবার পিঠে বইয়ের ব্যাগটাও এত ভারী যে, বাচ্চারা সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। স্কুলটা একটা তিনতলা বাড়ি–ওখানে না আছে কোনো মাঠ, না আছে কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা।

ক্লাস-হোমওয়ার্ক-কার্টুন, এখন এই হলো একটা শিশুর জীবন। ওর জীবনে নদী ফুল আকাশ পাখি কিছুই নেই। মা-বাবার সঙ্গেও যে তার খুব একটা কথাবার্তা হয়, তা-ও না। মা-বাবা কেন, আজকাল তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই কথা হয় না। সবাই টিভি-সিরিয়াল আর খেলার চ্যানেল দেখায় ব্যস্ত। এভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে কেবল ক্লাসের বই পড়ালে হবে না, তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ তার হৃদয়ে যে আবেগ আছে তা ভুল পথে পরিচালিত হলে মানুষের জন্য না হয়ে অমানুষের জন্য হতে পারে! কিন্তু আমরা তো দানবের সমাজ গড়তে চাই না। আমরা একটি মানবিক সমাজ গড়তে চাই।

[কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর]

গ্যাং কালচার শেখায় গেমস

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

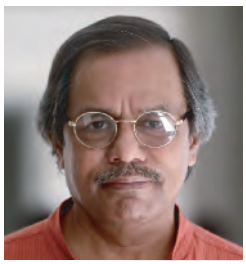

বর্তমান পরিস্থিতির দায় প্রথমত পরিবারের, দ্বিতীয়ত শিক্ষাব্যবস্থার। পরিবারগুলোর চিন্তা এখন বৈষয়িক উন্নতিকেন্দ্রিক। এতে করে দুর্নীতির বিশাল বিস্তার ঘটেছে এবং পরিবারগুলো নৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এর একটা প্রভাব শিশু-কিশোরদের ওপর পড়ছে। সনদনির্ভর লেখাপড়া শিশুদের বিনোদন বা অবসর দিতে পারে না। তারা গেমস খেলে বা ফেসবুক ব্যবহার করে। গেমস গ্যাং কালচার শেখায়, খেলার মাঠে দলের যে ধারণা তৈরি হয় তা শেখায় না।

[৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ 'নৃশংসতার চর্চা বাস্তবে, ভার্চুয়াল জগতে' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলোতে। সম্প্রতি ঢাকার উত্তরায় কিশোরদের গ্যাং কালচার-এর দৌরাত্ম্য এবং নৃশংসতার প্রসঙ্গে একথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম]

১৬ বছর বয়সের আগে মোবাইল ফোন ব্যবহার নয়

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার শুধু বিপজ্জনক নয়, এর চেয়েও বেশি কিছু। মোবাইলে ১৫ মিনিট কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়ে, শিশুদের ক্ষেত্রে আরো বেশি। তাই ১৬ বছর বয়সের নিচে কোনোভাবেই মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

দেশে এখন থাইরয়েড ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এর সম্ভাব্য প্রধান কারণ লোকালয়ে অনিরাপদ উচ্চতায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন এবং মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রখ্যাত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

আধুনিক গ্যাজেট ব্যবহার শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের অন্তরায়

অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার

নবজাতকের মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটে। আর এভাবেই তার মস্তিষ্ক বিকশিত হয়। যোগাযোগের সুবিধার্থে শিশুর মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে তৈরি হয় প্রায় ৭০০টি সিন্যাপস। এ পুরো প্রক্রিয়াটির ফলাফল ভালো না মন্দ হবে, তা নির্ভর করে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ওপর।

তাই শিশুর সঠিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন পরিবেশের যথাযথ উদ্দীপনা ও সাড়া দেয়ার সুযোগ। যেমন : শিশু যখন কিছু নিয়ে প্রশ্ন করে বা কৌতূহলী হয় তখন পরিবারের সদস্যরা সেটির সাথে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু টিভি, মোবাইল ফোন, ট্যাব শিশুকে একতরফা কিছু উদ্দীপনা দিতে থাকে–যেখানে শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখানোর বা ভাবের আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। এটি তার মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায়। এতে শিশুর মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও নবজাতক ইউনিটের প্রধান, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

যখন কোনো মোবাইল ফোন অপারেটর বলে, যত কথা তত সাশ্রয়–আমরা ভেবে দেখি না কীসের সাশ্রয়। মধ্যরাতে কম পয়সায় কথা বলা যাবে, এজন্যে মানুষ মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থাকছে। এই হলো আমাদের সমাজের চিত্র।

আমরা তো আগেও টেলিফোন ব্যবহার করতাম, কিন্তু তা ছিল প্রয়োজন। আর এখন হাজার কোটি টাকা শুধু কথা বলে অপচয় করা হচ্ছে। অথচ উন্নত অনেক দেশেই কিন্তু এরকম গণহারে মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে না। মোবাইল ফোন খুবই বিপজ্জনক। বাচ্চারা এটা নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, কানে আবার হেডফোন দিয়ে রাখে, আশেপাশে কী হচ্ছে সে কিছু শোনেও না। ড্রাইভাররা গাড়ি চালাচ্ছে আর ফোনে কথা বলছে। দুর্ঘটনার পরিমাণও বাড়ছে।

আমার মনে হয়, বর্তমানে মোবাইলসহ অন্যান্য গ্যাজেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। স্মার্টফোন আর এ ধরনের ডিভাইসগুলোর কারণে ক্রমেই চিন্তাভাবনা করার সামর্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলছি।

২০-২৫ বছর আগে *ফার্মা'স লাস্ট থিওরেম* নামে একটা থিওরেম সাত বছর চেষ্টা করে সমাধান করলেন ব্রিটিশ গণিতবিদ এন্ড্রু ওয়াইলস। একটা সমস্যা নিয়ে সাত বছর! এটা হলো মনোযোগ। এরকম মনোযোগ না হলে কেউ কোনো কাজে সফল হতে পারে না। যে-কোনো সমস্যার সমাধানও নির্ভর করে, আমি ওই কাজ নিয়ে কতটা লেগে থাকতে পারি, তার ওপর।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলতেন, It's not that I'm so smart. It's just that, I stay with problems longer. আসলে এটাই সাফল্যের চাবিকাঠি। আজকাল ছাত্রছাত্রীরা কোনোকিছুতেই এরকম লেগে থাকতে পারে না।

আমরা যদি দৌড়াদৌড়ি না করি, তাহলে পায়ের মাংসপেশি সবল হবে না। আমরা যদি হাত ব্যবহার না করি, তাহলে হাতের পেশি সবল হবে না। তেমনি আমরা যদি চিন্তা না করি, তাহলে মস্তিষ্কও সবল হবে না। আমরা যদি এখন মোবাইলে খেলাধুলা করতে ব্যস্ত থাকি, ফোন করায় ব্যস্ত থাকি, তাহলে চিন্তাশক্তি কখনো বিকশিত হবে না।

বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, দেখা করা, অনুভূতির আদান-প্রদান, সবকিছুই এখন মোবাইলে আর ইন্টারনেটে। এগুলো অর্থেরও অপচয়। এ যুগে তরুণদের একটি বড় অংশের মধ্যেই নৈতিক মূল্যবোধও গড়ে উঠছে না।

তাই স্মার্টফোনসহ যে-কোনো প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত বাচ্চাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে হবে অযথা এগুলো ব্যবহার করা থেকে ।

[শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

ভুক্তভোগীদের করুণ অভিজ্ঞতা

স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট আসক্তির পথ ধরে ব্যক্তিজীবনে, পারস্পরিক সম্পর্কে ও সমাজে ধেয়ে আসছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, অভিজ্ঞতা যেমনই হোক চারপাশের অনেকেই আজ কমবেশি ভুক্তভোগী। এমনই কয়েকটি টুকরো দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হলো। সঙ্গত কারণেই সবার নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হলো না।

ঘটনা ॥ ১

সেদিন ছিল এসএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। এক পরিচিতের সাথে দেখা হতেই জানতে চাইলাম, ছেলের পরীক্ষা কেমন হচ্ছে? উনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, ছেলে পরীক্ষা দিতে চায় না। এক প্রকার জোর করেই ছেলেকে পরীক্ষার হলে নিয়ে এসেছেন তিনি। ১০টায় পরীক্ষা শুরু, কিন্তু ৯টার সময়ও সে বিছানা ছাড়তে চাচ্ছিল না। সারারাত ছেলে ইন্টারনেট নিয়ে মেতে ছিল। কিছুই তো সে পড়ে নি, কী লিখবে?

জানতে পারলাম, জেএসসি পরীক্ষার সময় ছেলে আবদার করেছিল, গোল্ডেন এ প্লাস পেলে তাকে স্মার্টফোন, গিটার আর বাঁশি কিনে দিতে হবে। এটাই কাল হয়েছে। এরপর স্মার্টফোন ছাড়া আর কিছুতেই সে আগ্রহ বোধ করে না। কোনোকিছুতে তার মনোযোগ নেই। ছেলেটির মা বুঝতেই পারছেন না, কীভাবে কী হয়ে গেল।

ঘটনা ॥ ২

প্রবাসী এক ইঞ্জিনিয়ার ভীষণ ব্যস্ত তার অফিসের কাজে। তার স্ত্রী ব্যস্ত সংসারের কাজে। একমাত্র সন্তানকে সামলানো স্ত্রীর পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই সহজ সমাধান হিসেবে দুরন্ত সন্তানকে কম্পিউটার গেম-এ বসিয়ে দিয়ে দুজনেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

একসময় দেখা গেল, তিন বছরের বাচ্চা কম্পিউটারের গেম ও পাজল ঝটপট মেলাতে পারে। কিন্তু আচরণগতভাবে সে স্বাভাবিক নয়। সে খুবই অস্থির এবং কারো দিকে সরাসরি তাকায় না, কোনো প্রশ্নের উত্তরও দেয় না।

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা আর স্মার্টফোনে গেম খেলা ছাড়া তার অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই। সমবয়সী শিশুদের সাথেও সে মিশতে পারে না। এখন ডাক্তারদের আশঙ্কা–শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ঘটনা ॥ ৩

মেয়েটির বাবা মারা গেছে। আত্মীয়স্বজন সবাই মিলে তার বিয়ে ঠিক করল। হবু বর বিয়ের আগেই তাকে উপহার দিল একটি স্মার্টফোন। ধীরে ধীরে মেয়েটি ফোন-আসক্ত হয়ে পড়ল। সে সারাদিন শুধু ফোনে কথা বলে। বিয়ের দিনও দেখা গেল, কনে সেজেগুজে ফোনে কথা বলছে। কিন্তু বরের কানে ফোন নেই। শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও সারাদিন সে ফোন নিয়ে পড়ে থাকে। একসময় শুরু হয় অশান্তি।

পরবর্তীতে জানা যায়, সৌদিপ্রবাসী অন্য একটি ছেলের সাথে তার যোগাযোগ। মেয়েটিও সেখানে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একপর্যায়ে মেয়ের পরিবার প্রবাসী ছেলেটির সাথে যোগাযোগ করে এবং দূরে সরে যেতে বলে। এরপর ছেলেটি মেয়ের ছবি ও আজেবাজে কথা ফেসবুকে দিয়ে দেয়। বর্তমানে তার বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা হচ্ছে। এখন মেয়েটি শুধু কান্নাকাটি করে।

ঘটনা ॥ ৪

বর্তমানে শুধু তরুণরা নয়, অনেক বয়স্ক মানুষও ইন্টারনেটে আসক্ত। অভিভাবকেরা যেখানে তাদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত, সেখানে আমি চিন্তিত আমার মাকে নিয়ে। তার বয়স ৫৭। তিনি ফেসবুকে আসক্ত। তার সাথে তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কয়েকজন বন্ধুও আসক্ত। তারা ফেসবুকে ছবি দেয়া, লাইক, কমেন্টে মেতে থাকেন।

আমার মায়ের দুটো স্মার্টফোন। একটি নিজের, আরেকটি অফিসের। একটির চার্জ ফুরালে আরেকটি ধরেন। এভাবেই চলছে। এসব নিয়ে সময় নষ্ট তো করছেনই, সাথে আছে কোন ছবি ফেসবুকে দেবেন সেটা ঠিক করা ও এডিট করা। এজন্যে বেড়ে গেছে তার ছবি তোলার নেশা।

মা দিনশেষে বাড়ি ফিরে ফোনে লম্বা সময় কাটান। ফলে তার সাথে আমার কথাও হয় না। পাশে বসে আমি কথা বললেও তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। তিনি যে আসক্ত এটা তিনি বোঝেন না, স্বীকারও করেন না।

ঘটনা ॥ ৫

আমার একজন বন্ধু খুব প্রতিভাবান। কিন্তু ক্লাসের পড়াশোনায় তার অবস্থান পেছনের দিকে এবং এর প্রধান কারণ ইন্টারনেট আসক্তি।

সে প্রজেক্টের কাজ ও জটিল পড়া বোঝার জন্যে প্রতিনিয়ত ইউটিউবের সাহায্য নেয়। কিন্তু কাজের টিউটোরিয়াল দেখার চেয়ে, অকাজের ভিডিও দেখা হয়ে যায় বেশি। রিকমেন্ডেড ভিডিও দেখতে দেখতে কখন যে সময় শেষ হয়ে যায়, সে টেরই পায় না। সেইসাথে ফেসবুকে পুরো সময় লগ ইন থাকে। এভাবে পাঁচ মিনিট-এর বিরতি কখনোই এক-দুই ঘণ্টার আগে শেষ হয় না।

ঘটনা ॥ ৬

ছেলেটি মাত্র সাত বছর বয়সে মা-বাবার সাথে আমেরিকায় পাড়ি জমায়। সে ভালোভাবেই হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন শেষ করে। গণিত প্রতিযোগিতা ম্যাথ ম্যানিয়া-তে সে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত হয়।

ইলেভেন গ্রেডে পড়ার সময় সে ঝুঁকে পড়ে ভিডিও গেমের দিকে। টুয়েলভ গ্রেড শেষ করে সে কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি নিতে ছয়-সাত মাস ঘরে বসে ছিল। এ সময় অনলাইন ও ভিডিও গেমে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পড়ে সে। তার ওজন বেড়ে ৭০ কেজি থেকে ১২৫ কেজি হয়ে যায়। সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং তার অ্যাজমা বেড়ে যায়। এমনকি মাথার সব চুলও পড়ে যায়।

এ শারীরিক অবস্থার জন্যে সহপাঠীরা তাকে উত্যক্ত করত এবং ঘটনা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। এরপর সে কলেজ ছেড়ে দিল। বর্তমানে তার ওজন ১৮০ কেজি। সে রাতদিন কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চার-পাঁচ জন মিলে গ্রুপ করে অনলাইন গেমে অংশ নেয়। সে কারো সাথে মেশে না, তার রয়েছে ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডস।

এডভোকেট সুব্রত বর্দ্ধন, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে আমার পরিবার। আমাদের একমাত্র মেয়ে অপূর্বা বর্দ্ধন স্বর্ণা। মেয়ের বয়স যখন ১০, তখন আমাদের ছেলেটার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটি অনেক মেধাবী। সে খুব সুন্দর গান গাইত। ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত সম্মিলিত মেধা তালিকায় বরাবরই সে প্রথম হয়েছে। পিএসসি-তে বৃত্তি পেয়েছিল। ক্লাস সেভেন থেকে তার মাঝে আমরা কিছু পরিবর্তন লক্ষ করি। সে আগের চেয়ে চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল। রেজাল্টও ভালো হচ্ছিল না।

এ সময় মায়ের নতুন এন্ড্রয়েড ফোনটা সে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। প্রথমদিকে পড়াশোনার কাজেই সে এটা ব্যবহার করত। কিন্তু আস্তে আস্তে মোবাইল ব্যবহারের প্রবণতা বাড়তে থাকে। বাসায় যতক্ষণ থাকত সারাক্ষণ মায়ের স্মার্টফোনটি নিয়েই সময় কাটাত। এভাবেই চলছিল।

হঠাৎ একদিন সকালে আমরা মেয়েকে আবিষ্কার করি সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়। অথচ রাতেও মেয়ের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তার আচরণে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে নি। সে বলল, রাত জেগে সে পরীক্ষার পড়া তৈরি করবে। আর পরদিনই এ ঘটনা। আমার ভুল হয়েছে, মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার ভেবে তার গতিবিধি আমি খতিয়ে দেখি নি। ইন্টারনেটে সে কী করছে বা কাদের সাথে যোগাযোগ করছে, জানতে চেয়েছি কখনো কখনো। কিন্তু মেয়ের বোঝানোতে আমি প্রভাবিত হয়েছি। বুঝতে পারি নি, এই স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট আসক্তিই তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।

সন্তান হারানো একজন পিতা হিসেবে আমি বলতে চাই, কোনো মা-বাবা সন্তানকে রাত জাগতে দেবেন না। রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহার খুব ধ্বংসাত্মক হয়। ১৮ বছরের নিচে সন্তানকে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে দেবেন না। খেয়াল রাখুন, সন্তান অনলাইন গেম খেলছে কিনা। এসব গেমের টার্গেটই হয় টিনএজাররা। সন্তানের দিকে আরো সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে।

বর্তমানে শুধু শহরে না গ্রামেও স্মার্টফোনের ছড়াছড়ি। পরিবারের সদস্যরা বিদেশে গিয়ে প্রথমেই আত্মীয়স্বজনদের জন্যে একটা এন্ড্রয়েড সেট পাঠায়। সেই সেটটা কিন্তু আর অভিভাবকের হাতে থাকে না, টিনএজ সন্তানের হাতে চলে যায়। আমি চাই অভিভাবকরা সবাই সচেতন হোক।

এই সমস্যাগুলো সমাধানে এগিয়ে আসা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। স্কুলের আইসিটি শিক্ষকও যেন কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের এই ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আপডেটেড থাকেন। অভিভাবক-শিক্ষার্থী সবাইকে নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনায় যাওয়া উচিত। সেইসাথে মেডিটেশন করা উচিত। তাহলে আমাদের সন্তানদের মনোবল দৃঢ় হবে, তাদের আত্মজাগরণ ঘটবে। তারা সহজে কারো দ্বারা প্রভাবিত হবে না। আমি মনে করি, আতঙ্ক নয় গণসচেতনতা প্রয়োজন। আমার স্বর্ণার মতো হাজারো স্বর্ণা যেন বেঁচে থাকে, আমি সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

[হলিক্রস স্কুলের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী অপূর্বা বর্দ্ধন স্বর্ণা-র আত্মহত্যার খবর সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয় ৫ অক্টোবর ২০১৭। তার পরিবারের ধারণা ইন্টারনেট ও অনলাইন গেম আসক্তির শিকার হয়েই সে এই পথ বেছে নিয়েছে]

ওদের পৌষমাস আমাদের সর্বনাশ

ন'মাসের শিশু স্মার্টফোনের স্ক্রিন স্ক্রল করা শিখে গেছে। ইউটিউবে ভিডিও না দেখে সে খেতেই চায় না। এ নিয়ে মা-বাবা আহ্লাদে আটখানা। 'শিশু আইনস্টাইনের' কর্মকাণ্ড শুনে অন্য অভিভাবকরাও তৎপর হয়ে ওঠেন নিজেদের সন্তানদের 'স্মার্ট' বানাতে। মজার বিষয় হলো, এদের অধিকাংশ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন না যে, স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও ইউটিউব-জাতীয় কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহীরা প্রযুক্তিপণ্য-ইন্টারনেট থেকে তাদের সন্তানদের শত হাত দূরে রাখেন।

প্রযুক্তি-মাফিয়াদের কুশলী প্যারেন্টিং

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনকুবের বিল গেটসের কথাই ধরা যাক। তার প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট সারা পৃথিবীর কম্পিউটার জগৎ দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করছে। অথচ তার সন্তানরা দিনে সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিটের বেশি কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। কেবল তা-ই নয়, গেটস সন্তানদের বয়স ১৪ হবার আগে স্মার্টফোন তো দূরের কথা, মোবাইল ফোনই কিনে দেন নি।

আছে গল্প বাকি আরো। আইফোন ও আইপ্যাডের নতুন মডেল বাজারে আসার আগেই অনলাইনে লাখ লাখ পিস আগাম বিক্রি হয়ে যায়। নিজের কিডনি বেচে এক তরুণ আইপ্যাড কিনেছে এমন নজিরও আছে। যে গ্যাজেট নিয়ে এত মাতামাতি, তার নির্মাতা অ্যাপলের কর্ণধার স্টিভ জবস কখনো তার সন্তানদের আইপ্যাড ব্যবহার করতে দেন নি।

ফেসবুকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিহাপিতিয়া সাত বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর গুরুদায়িত্বে থাকলেও নিজে ফেসবুক ব্যবহার করেন না। তিনি এ-ও বলেছেন, "My kids are not allowed to use that shit." ফেসবুক পোস্ট/ ছবিতে 'লাইক' পাওয়ার জন্যে মানুষ কত উদ্ভট কাণ্ডই না করে। এই লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজের ফোন থেকে সযত্নে *লাইক* বাটনটি সরিয়ে দিয়েছেন।

শুধু তা-ই নয়। ফেসবুক-টুইটারের শীর্ষ নির্বাহীরা কেউই আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো এই অ্যাপগুলো ব্যবহার করেন না। কালেভদ্রে স্ট্যাটাস দেন বা টুইট করেন। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ তো আরো এক ডিগ্রি বাড়া। তার ফেসবুক একাউন্ট দেখভালের দায়িত্বে আছে ১২ জন সহকারী। অর্থাৎ সিলিকন ভ্যালির হর্তাকর্তারা ও তাদের সন্তানরা প্রযুক্তিপণ্য-সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপস থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন।

তাহলে তারা কি এমন কিছু জানেন যা আমজনতা জানে না?

মগজ আপনার, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের লাগাম তাদের হাতে

ঠিক তা-ই। এসব প্রযুক্তি-মাফিয়ারা খুব ভালো করেই জানেন, স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তিকর। মাদকের চেয়েও ভয়ংকর সে আসক্তি। গুগলের সাবেক কর্মী ত্রিস্তান হ্যারিস এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রচলিত ধারণা হলো–প্রযুক্তি নিরপেক্ষ; এর প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে প্রভাব ভালো না মন্দ হবে। এই ধারণা মোটেও সত্যি না। টেক কোম্পানিগুলো তাদের বাতলে দেয়া উপায়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্যে মানুষকে প্রভাবিত করে। যাতে তারা দীর্ঘক্ষণ স্মার্টফোন/ অ্যাপে সময় কাটায়। সেই সুযোগে কোম্পানিগুলো অঢেল পয়সা কামাতে পারে।

মানুষকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেশাগ্রস্তের মতো বুঁদ করে রাখার চক্রান্তকে বলা হচ্ছে 'ব্রেইন হ্যাকিং'। খুলির ভেতরে মগজ আপনার হলে হবে কী, নিয়ন্ত্রণের লাগাম চলে গেছে টেক কোম্পানিগুলোর হাতে। মানুষের মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক জীবন তছনছ হয়ে যেতে পারে তা জানা সত্ত্বেও টেক এক্সিকিউটিভরা পিছপা হন নি। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা বরং এসব আসক্তিকর প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষকে আরো উৎসাহিত করেছেন। এ স্বীকারোক্তি দিয়েছেন স্বয়ং ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট শন পার্কার।

প্রযুক্তি-মাফিয়ার সন্তানরা পড়ে স্মার্টফোন-কম্পিউটারহীন স্কুলে

শৈশবেই কম্পিউটার ও স্মার্টফোন জাতীয় যন্ত্র ব্যবহারে শিশু অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার সৃজনশীলতা, মনোযোগের সময়সীমা ও অপরের সাথে ভাব আদান-প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। পেশাগত কাজের সুবাদে গুগল অ্যাপল ইয়াহু-র এক্সিকিউটিভরা এটা সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। তাদের কয়েকজন স্বীকার করেছেন, তেল ও জলের মতো লেখাপড়া ও কম্পিউটারও মিশ খায় না। তাই সন্তানদের তারা এমন স্কুলে পাঠান যেখানে কম্পিউটার স্মার্টফোন ট্যাব এগুলোর ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ।

টেক এক্সিকিউটিভদের দ্বিমুখী এ আচরণ সম্পর্কে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যাডাম অ্যাল্টার বলেন, এসব টেক কোম্পানির কর্মকর্তারা জনসমক্ষে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাদের পণ্যের গুণকীর্তন করেন। অন্যদিকে তাদের সন্তানদের পাঠান এমন স্কুলে যেখানে এসব প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহারের সুযোগই নেই।

আসক্তির চূড়ান্ত ॥ ক্লাসরুমে এসএমএস চালাচালি

২০১৫ সালে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিশ্বব্যাপী একটি গবেষণা পরিচালনা করে। তাতে দেখা গেছে, ক্লাসরুমে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট আগের চেয়ে ভালো হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং শিক্ষার মান যেসব দেশে উন্নত (বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো) তারা ক্লাসরুমে প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক।

এত সতর্কতা অবলম্বনের উপযুক্ত কারণও আছে বটে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশে শিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা একটি সমস্যা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তা হলো–ক্লাসরুমে বসেও ছাত্রছাত্রীরা মোবাইল ফোনে মেসেজ চালাচালি করছে। টিফিনের বিরতিতে খেলাধুলার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। আসক্তের মতোই তারা ডুবে থাকছে ভার্চুয়াল জগতে। এ সমস্যার বিহিত করতে না পেরে ফ্রান্সের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৮ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে স্কুলে মোবাইল ফোন আনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

টেক এক্সিকিউটিভদের সন্তানরা অবসরে যা করে

কোটি কোটি শিশু-কিশোর-তরুণের মস্তিষ্কের বারোটা বাজালেও এসব প্রযুক্তির উদ্ভাবকরা ঠিকই আগলে রাখেন নিজ সন্তানদের। স্টিভ জবস প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্তানদের নিয়ে একসাথে খেতে বসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের বই ও ইতিহাস সম্পর্কে তাদের সাথে আলোচনা করতেন। ইউটিউবের সিইও সুসান ওজকিকি সন্তানদের খেলাধুলা ও বই পড়ায় উৎসাহিত করেন। টুইটারের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও ইভান উইলিয়ামসের দুই শিশুপুত্র আইপ্যাডের জন্যে বহু আবদার করলেও তিনি সোজা নাকচ করে দেন। আইপ্যাডের বদলে ওদের তিনি কিনে দিয়েছেন কয়েকশ বই।

দাসত্বের শেকল অথবা মুক্তির পথ ॥ কোনটা বেছে নেবেন?

অলক্ষ্যে বসে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ শত শত কোটি মানুষের প্রতিদিনের চিন্তাভাবনা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ছক সাজাচ্ছে। মানবসভ্যতা কখনোই এমন ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয় নি। প্রিয় পাঠক, সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব এখন আপনার। ভার্চুয়াল জগতের দাস হয়ে হতাশ বিষণ্ন পরিবার-বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাবেন নাকি আপনার মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তির ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে লাভ করবেন–সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন?

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ২৩ জানুয়ারি ও ২৬ জানুয়ারি ২০১৮
দ্য টাইমস, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮; বিবিসি, ১২ ডিসেম্বর ২০১৭

ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার শিশুদের জন্যে গাইডলাইন

(তথ্যসূত্র : আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস)

যুক্তরাষ্ট্রের শিশু বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস। ২০১৬ সালে তারা শিশুদের সুরক্ষায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, সব বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করা উচিত। কারণ শিশুরাই এসব স্ক্রিনের সবচেয়ে বড় শিকার।

শিশুর বয়স ১৮ মাস বা এর কম হলে–

সব ধরনের ডিজিটাল মিডিয়া থেকেই তাকে দূরে রাখতে হবে। শিশুর মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশ ও মা-বাবার সাথে মমতাপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করতে হলে 'স্ক্রিন টাইম' নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। মা ও পরিবারের অন্যদের সাথে যত সরাসরি ও মুখোমুখি ভাব-বিনিময় ঘটবে, শিশুর মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশে তা তত বেশি উপকারী হবে।

ফোন-টিভি-কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে সরাসরি না তাকালেও শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কীভাবে? সন্তানকে খাওয়ানোর সময় মা নিজে হয়তো টিভি দেখছেন। তখন টিভির শব্দ ও আলো শিশুর স্নায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে, যা শিশুর ঘুম ও মনোযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলো, ফোন-টিভি-কম্পিউটার মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। মা-বাবা সন্তানকে সময় না দিয়ে টিভি/ ফোনের প্রতি বেশি মনোযোগী হলে তাদের ক্রমাগত অবহেলা সন্তানের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

ফলে ভবিষ্যতে সেই শিশুর আচরণে মানসিক অসুস্থতার নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এ নীতিমালার মূল প্রণেতা ড. ইয়োলান্ডা রিড তাই বলেন, টিভিকে বেবি-সিটার বানাবেন না। সন্তানের সাথে গল্প করুন অথবা তাকে বই পড়ে শোনান।

শিশুর বয়স দুই থেকে পাঁচ বছর হলে–

এই বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে টিভি/ কম্পিউটার ব্যবহার দিনে মাত্র একঘণ্টার জন্যে সীমিত করুন। আপনিও তার সাথে বসে দেখুন। তবে কী ধরনের অনুষ্ঠান তাকে দেখাচ্ছেন সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হোন।

কারণ বিজ্ঞাপন বা অ্যানিমেশন বোঝার মতো মানসিক সক্ষমতা দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের নেই। বড় শিশুরা পারলেও এই বয়সী শিশুরা কার্টুনের কাল্পনিক জগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

শিশুর বয়স ছয় বছরের বেশি হলে–

আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস স্বীকার করে নিয়েছে যে, শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশে ডিজিটাল মিডিয়া কখনোই খেলাধুলা, পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলামেশার বিকল্প হতে পারে না।

প্রযুক্তিদক্ষ হোন ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে বাঁচুন!

সন্তানের বন্ধু হোন, তাকে পরিবারের অংশ করে নিন

সন্তানকে বকাঝকা নয়, উদ্বুদ্ধ করুন। তাকে ঘরের কাজে সম্পৃক্ত করুন। সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন। আসক্ত হওয়ার মতো অবসর সময় যেন সন্তানের না থাকে। ভাইবোনের সাথে শেয়ার করতে শেখান তাকে। আপনিই হোন তার প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

আপনার সন্তানের রোল মডেল আপনিই

কথা নয়, সন্তান অনুসরণ করে আপনার আচরণ। আপনি ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হলে সন্তানকে এ থেকে বিরত রাখা কষ্টকর হবে। তাই আগে নিজে ফেসবুক বর্জন করুন, সন্তানকেও এ থেকে দূরে রাখুন।

১৮'র আগে স্মার্টফোন নয়

সন্তানের আবদার মেটাতে বা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে গিয়ে ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন কিনে দেবেন না। ঘরে শিশুরা থাকলে স্মার্ট টিভিকে না বলুন। কারণ কৌতূহলের বশে সে সহজেই ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করুন

প্রয়োজন ছাড়া রাত্রি জাগরণ ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। এ থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাত ১১টার পর মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার-জাতীয় সকল গ্যাজেট বন্ধ রাখুন। সন্তান সারাক্ষণই রুমের দরজা বন্ধ করে রাখছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পরিবারে নৈতিকতা ও ধর্মের শাশ্বত শিক্ষা মেনে চলুন

নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী অনুধাবনে ও অনুশীলনে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও অনুশীলন করুন।

মেডিটেশনকে পারিবারিক রেওয়াজে পরিণত করুন

যেসব সঙ্গ আসক্তির কানাগলিতে ঠেলে দেয়, তাদের পরিত্যাগ করুন। পরিবারের সবাই মিলে প্রতি বৃহস্পতিবার পারিবারিক মেডিটেশন করুন। সপরিবারে ফাউন্ডেশনের সাদাকায়ন, আলোকায়ন ও আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে অংশ নিন।

এগিয়ে আসুন সৃষ্টির সেবায়

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজ হতাশা-বিষণ্নতা-একাকিত্বের অনুভূতি হ্রাস করে। বাড়ায় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা। তাই সাধ্যমতো নিবেদিত হোন সৃষ্টির সেবায়, মানুষের কল্যাণে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : বিশেষ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd